আমি ও ফকির দাদু

তানিম হায়াত খান (রাজিত) - সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

আমার দাদুরা ছিলেন পাঁচ ভাই। ওনাদের মাঝে জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন উস্তাদ বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব আর আমার দাদু উস্তাদ আয়েত আলী খাঁ ছিলেন উপমহাদেশ খ্যাত। কিন্তু যাঁর কারণে তাঁদের সংগীতে পদার্পণ, তিনি হলেন ওনাদের মেঝো দাদা ফকির (তাপস) আফতাবুদ্দিন খাঁ সাহেব। ১৮২০ সালের দিকে তিনি কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বাঁশরী বাজিয়ে শুনাতেন। ওনার সবচাইতে পরিচিতি ছিল ওনার আধ্যাত্বিক শক্তির জন্যা আর উনি একসাথে তিন রকমের যন্ত্র বাজাতে পারতেন। কখনও হারমোনিয়াম, বাঁশি আর তবলা। কখনো দোতারা, বাঁশি আর হারমোনিয়াম। এজন্য উনি হাত এবং পা সব কিছুই ব্যবহার করতেন।

উনি পরলোকে চলে যান চুল দাড়ি সাদা হবার আগেই। মাত্র ৩৪ বছরে। তারপর থেকেই আমাদের আদি নিবাস বাংলাদেশের ব্রাহ্মনবাড়িয়ার শিবপুর গ্রামে ওনার মৃত্যু দিনটাতে একটা বিরাট আয়োজন করে সারারাত ব্যাপী গানবাজনা চলে। এখনো চলছে। প্রতি বছর ২৫ জানুয়ারী। গানের মানুষ, তাই গান বাজনা দিয়েই ওনাকে স্মরণ করা। `

তো সেই ওরশে উপস্থিত হয় আসে পাশের গ্রামের সমস্ত মানুষ। তারা তিন দিন ব্যাপী শিবপুর গ্রামে থেকে যান। সেই ওরশে কোনো না কোনো সময় হাজির হওয়া আমাদের পারিবারিক একটা ঐতিহ্য। কিন্তু যাব বললেই তো আর যাওয়া হয়ে না। এই ২১ শতকে এসেও শিবপুর গ্রাম যেন দুর্লোন্ঘনীয়। তাই অনেকেরই সেখানে যাওয়া হয়ে উঠে না বা উঠেনি। তবে একটা কথা পারিবারিক ভাবে চালু আছে। যদি ফকির বাবা চান তাহলেই ওনাকে দর্শন সম্ভব। কারো কারো সারাজীবনে বিভিন্ন কারণে হয়ত হয়ে উঠেনি, আসলে হয়ত ফকিরের ডাকটা মন থেকে পাননি।

তো এবার আমার কথা বলি। তখন আমার বছর বিশেক বয়স। এর আগেও দুবার গিয়েছি ওরশে। আর প্রতিবার ওরশে যাওয়াটা যেন আমার কাছে অদ্ভূত একটা নেশার মত হয়ে গিয়েছিল। মনে হত সবসময় দাদু আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু সেবার আনুষঙ্গিক কিছু কারণে যাওয়াটা কেন যেন খুব জটিল হয়ে যাচ্ছিল। কেন? কারণ একটা পারিবারিক কেস চলছিল কোর্টে। যার শুনানি ধার্য্য হলো ঠিক ২৫ জানুয়ারী. আমার তো মাথায় হাত। এখন ? কিন্তু মন বলছিল কিছু একটা হবে, কোনভাবে হয়ত যাওয়া হয়ে উঠবে। ২৪ তারিখ আমার খুব ঘনিষ্ট বন্ধু আমান কে বলে রাখলাম ২৫ তারিখ সকালে রেডি থাকতে, আমার ফোন পেলেই বেরিয়ে পড়বে। গন্তব্য শিবপুর। তো সেটা সম্ভব শুধুমাত্র যদি কোর্টের কাজ সকাল ১০ টার মধ্যে শেষ হয়। কারণ শিবপুর যাবার রাস্তা এতই দুর্গম যে সেটা ছিল সারাদিনের ধাক্কা। সেখানে যাবার বাহন গুলো ছিল এরকম - ট্রেন, বাস, নৌকা, রিক্সা। তবে রাত হয়ে গেলে নৌকো চলে না, আর সেই চড়াই উতরাই মেঠো পথে রাতে রাস্তায় রিক্সা তো চলার পশ্নই আসেনা। তাই যেভাবেই হোক বিকাল ৪:৩০ এর মধ্যে ব্রাহ্মনবাড়িয়ার কাউতলির ঘাটে না পৌছলে বাকিটা দুরাশা।

তো এসে গেল ২৫ জানুয়ারী। সকাল সকাল কোর্টে চলে গেলাম। হয়ে গেল বাজিমাত। শুনানি স্থগিত! কারণ ওপর পক্ষ অনুপস্থিত। ব্যস, আমাকে পায় কে। কোর্ট হাউস থেকেই সরাসরি আমান কে ফোন (ততদিনে মোবাইল চলে এসেছিল, ১৯৯৮ সালের কথা)। আমান কে বলে দিলাম সরাসরি বাস ডিপো তে চলে যেতে। কারণ ততক্ষণে সকালের ট্রেন ছেড়ে গেছে। তাই বাসই ভরসা। তো চললাম বাসে করে দুজন। ব্রাহ্মনবাড়িয়া যেতে ফেরি পার হতে হয়। সেই ফেরি ঘাটে পৌঁছালাম ২ ঘন্টা চলার পর। কিন্তু ফেরি ঘাটে এসে দেখি বিরাট লাইন। কারণ ফেরি কর্মচারীদের ধর্মঘট। ফেরি চলছেনা। আমি আর আমান বাস ছেড়ে নেমে গেলাম। ভাবছি কিভাবে নদী পার হওয়া যায়। হঠাত দেখি একটা নৌকা বোঝাই করে লোক জন নদী পার হচ্ছে। নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের জন্য প্রতিটা মিনিট যেন একেকটা ঘন্টা। আমরা ঝেড়ে দৌড় দিলাম। লাফ দিয়ে ফেরিতে গিয়ে উঠলাম। এক দৌড়ে ফেরিটা পুরো পার হয়ে সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে হাঁক ছাড়লাম, যেন নৌকাটা একটু থেমে আমাদের নিয়ে যায়। কপাল ভালো। সেই নৌকা এলো , আমরাও উঠে পড়লাম। নদী পার হয়ে দেখি ওপারেও লম্বা গাড়ির লাইন, একই কারণে। আবার দৌড়ানো, দৌড়ে গাড়ির লাইন পার হয়ে যাবার পর দেখি একটা মানুষ বোঝাই বাস কাউতলী ঘাটের দিকে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। বাসটাতে তিলধারণের জায়গা নেই। এমনকি পাদানিতেও মানুষ ঝুলছে। আবার এদিকে দ্বিতীয় কোনো বাসও দেখা যাচ্ছেনা। আর যাই কোথায়। পিছনের মই বেয়ে দুইজন সোজা বাসের ছাদে উঠে পড়লাম। তবে ছাদে বেশ ভালো ভাবে বসবার ব্যবস্থা ছিল এটা ঠিক। মালামাল রাখার জায়গাতে দুইজনের জায়গা হয়ে গেল। শুরু হলো আরও দু' ঘন্টার যাত্রা।

ততক্ষণে বেলা আড়াইটা। শীতের দিন। সন্ধ্যে হয় খুব দ্রুত। আর নৌকাতে যেতে লাগে ৪৫ মিনিট। তাই নৌকা এমন হিসাব করে ছাড়ে যেন সন্ধ্যের আগেই গোপন ঘাটে পৌছে যায় (গোপন হলো শিবপুর গ্রামের সবচাইতে কাছের ঘাট)। আমাদের বাস কাউতলী ঘাটে পৌঁছল ঠিক ৪:৪৫ এ। ঘাটে গিয়ে দেখি শেষ নৌকা একেবারে ছেড়ে দিল দিল বলে। আবার সেই দৌড় আর সেই সাথে গলার আওয়াজের প্রয়োগ। তো আবার কোনো ভাবে জায়গা হয়ে গেল নৌকাতে। চললাম। ৪৫ মিনিট পর যখন গোপন ঘাটে পৌছালাম, তখন গোধুলি। প্রায় অন্ধকার। যা ভেবেছিলাম তাই। কোনো রিক্সা নেই। অতঃপর পদব্রজেই যেতে হবে, আর তো কোনো উপায় নাই।

গোপন ঘাটে নেমে সবাই যার যার রাস্তাতে চলে গেল. শুধু রয়ে গেলাম আমি আর আমান. ভাবছিলাম এই অন্ধকারে পথ চিনবো তো? হঠাত সেই নৌকা থেকেই আরেকজন বের হয় এসে প্রশ্ন করলো, "আপনারা কোথায় যাবেন?" বললাম ফকির বাবার মাজারে. উনি বললেন, "আমিও মাজারে যাব, আমার বাড়ির সামনে দিয়েই আপনারা যাবেন. চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি".

এই গন্ডগ্রামে এতটা রাস্তা একদম সুম্পূর্ণ অচেনা একজন লোকের সাথে অন্ধকারে হেঁটে যেতে হবে, কিন্তু আশ্চর্য , একটুও ভয় লাগেনি। কারণ এই অবদি যে ভাবে হলো , তাতে কেমন যেন বুঝে গিয়েছি, ফকির দাদুর শক্তিতেই সব হচ্ছে - সেই সকালের কোর্টের শুনানি থেকে, তাহলে এটাও হয়ে যাবে।

ঝাড়া দু ঘন্টা হেঁটে পৌঁছালাম ফকির দাদুর মাজারে.....রাত বাজে তখন প্রায় ন'টা. প্রায় ১২ ঘন্টার এক এডভেঞ্চার .....

ফকির দাদু কে একটু খানি দেখবার আকাঙ্খা , একটু আশির্বাদ। সেই সাথে আবার যেন জানলাম - শুধু মাত্র ফকির সাহেব যদি চান দেখা দিবেন, শুধু তখনি মিলবে তার আশির্বাদ।

নয়তো নয়।

আমি সেই প্রচন্ড সৌভাগ্যবানদের একজন হয়ত বা।